প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভারতীয় বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে শ্রেষ্ঠতম তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ঊনবিংশ শতাব্দী ও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীই শুধু নয়, আধুনিক বাঙালীর ইতিহাসে এত বড় একজন খাঁটি কর্মযোগী আর দেখা যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁস কোনভাবেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমতুল্য নয় বরং অনেকটা সাধারন মানের। রেনেসাঁস শুধু মানুষকে যুক্তির চাবিকাঠি দেয়নি, দিয়েছে আত্মপ্রকাশর স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বিদ্যাসাগর ছিলেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। ইউরোপীয় নবজাগরণের হাত ধরেই ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদ শব্দ দুটি এসেছে। ধর্মের বাহ্যিক দিকটির প্রতি বিদ্যাসাগর বরাবরই উদাসীন দিলেন। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে তিনি লৌকিক ক্রিয়া হিসাবই মনে করতেন। বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাস একান্তই তাঁর নিজস্ব। মানব কল্যাণের বাইরের কোন বিষয়কে তিনি ধর্ম হিসাব মানতে রাজি ছিলেন না। আর বিদ্যাসাগরের সমাজ ও নারীমুক্তি সর্ম্পকিত কাজসমূহকে ইউরোপীয় পরিভাষায় মানবতাবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর যুগের সবচাইতে অগ্রসর মানুষ এবং বর্তমান যুগেও আমরা তাঁকে যাবতীয় সামাজিক প্রগতিমূলক ক্রিয়াকলাপের উৎসমুখ এবং প্রেরণাস্থল হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, যেহেতু বিদ্যাসাগর ভাবিত সংস্কার আজও তার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদের সামনে দণ্ডয়ামান। তাই প্রাসঙ্গিক কারণেই আজ আর আমরা শুধু বিদ্যাসাগর কৃত সংস্কার কার্যের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারিনা, বিদ্যাসাগরের সমগ্র আধুনিক মননটিকে আত্মস্থ করে আমাদের আজ এগিয়ে যেতে হবে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে। আমাদের ঋণ স্বীকারের মাধ্যমেই হয়ে উঠতে পারে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী

লেখক

সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কুশমণ্ডি সরকারি মহাবিদ্যালয়, কুশমন্ডি,
দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
soumen.psaha@gmail.com

শুভময় ঘোষ
প্রধান শিক্ষক, ময়নাগুড়ি রোড
হাইস্কুল,জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

কর্মপ্রতিভার পুনঃ মূল্যায়ন। আমাদের জীবন্ত অস্তিত্ব তাঁকে বাদ দিয়ে নয়। কেননা তিনি মিশে আছেন আমাদের আজকের ভাবনায়।

সূচক শব্দ: ঊনবিংশ শতাব্দী, রেনেসাঁ, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদ, বুদ্ধিজীবি, ইউরোপীয়।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

মূল প্রবন্ধ-

"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যু নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আরম্ভর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠানে করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না ..... এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব বিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন"। -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিশতবর্ষ অতিক্রান্তের পর্বেও প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভারতীয় বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা বা আলোকপাত করাই বর্তমান নিবন্ধের মূল লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে আলোচনার অনুষঙ্গ হিসেবে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য সেটি হলো বিদ্যাসাগরই প্রথম বাঙালি, প্রথম আধুনিক ভারতীয়; যিনি সর্বভারতীয় পরিচিতি পেয়েছিলেন তাঁর সমসময়েই। এছাড়াও বিদ্যাসাগর চর্চা বাঙালির বৌদ্ধিক অঙ্গনের অন্যতম আলোচনার বিষয়ও বটে। বিদ্যাসাগর সমকালেও যেমন ছিলেন আলোচিত ব্যক্তিত্ব, তেমনি উত্তরকালেও। সেই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত। আজও কথা বুনে চলেছেন। স্পর্ধিত লড়াইয়ে তিনি কখনো হাল ছাড়েননি। আসলে আমরা বাঙালিরা ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছি। কানে শুনতে পাচ্ছি তাঁকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শব্দ। আসলে মানুষটি আজও সর্বজনীন। অগাধ আস্থা, আত্মবিশ্বাস, মানবিকতার আরেক নাম বিদ্যাসাগর। বিশ্বব্যাপী স্বার্থপরতা, নীচতা, ক্রুরতার বিরুদ্ধে প্রবলতম ধিক্কার জানান তিনি। মার্ক্সের মতো গণসংস্কৃতির পক্ষে বিজ্ঞান চেতনা ও অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় কড়া নেড়েছেন তিনি। অনেক বাধা এসেছে কিন্তু নতি স্বীকার করেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এক অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ছাড়া ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদরাও আছেন। তথাকথিত ডান ও বামপন্থীরা ছাড়া মানবেন্দ্র রায় পন্থীদেরও এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। প্রচুর রেফারেন্স কন্টকিত ও পুনরুক্তিমূলক এইসব লেখা থেকে একটি সাধারণ সূত্র এই বেরিয়ে এসেছে যে - ঊনবিংশ শতাব্দী রেনেসাঁস কোনোমতেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমতুল্য নয়, বরং অনেক সাধারণ মানের। বঙ্গীয় নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা বহুবিধ। তা ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সেখানে অস্ফুট, বৌদ্ধিক চিন্তার প্রসার সেখানে শীর্ণ, নতুন কোন দার্শনিক চিন্তার সেখানে প্রকাশ নেই; সবচেয়ে বড় কথা, এই রেনেসাঁর সাধারণভাবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ। দরিদ্র সমাজের মধ্যে তার প্রভাব নেই বললেই চলে। কাজেই শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর অসম্পূর্ণতা অপ্রকট থাকছে না। এমনকি এই নবজাগরণকে বর্ণহিন্দু নবজাগরণ যদি বলি তাহলে অন্যায় হয় না। অতএব বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন যদি আজ করতেই হয়, এই পটভূমিকা স্মরণ রেখেই করতে হবে। এমনিতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। এমন কোন বাঙালি মনীষী বা চিন্তাবিদ নেই যিনি তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেননি। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্র সুন্দরের আলোচনা দুটি এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাড়িয়ে আছে। অসাধারণ মানের এই আলোচনা দুটিতে ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও সামাজিক কৃতিত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাধারার টানাপোড়েনের অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যাসাগরের

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

মূল্যায়ন করা নবীন প্রজন্মের দায়িত্ব। নইলে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অতীপ্রচার বা অপপ্রচার দুই-ই ঘটতে পারে। অথচ বিদ্যাসাগরের দামী অসংখ্য মর্মরমূর্তি নির্মাণ বা ঐ মর্মরমূর্তির মুণ্ড ছেদন কোনোটিই আমরা চাই না।

তাঁর চিন্তাভাবনা যাতে বিস্তার লাভ করতে না পারে সেই জন্যই কি তাঁর মূর্তি ভাঙ্গা হয়? আধুনিকতার নামে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হয়? বাকশক্তি হরণ করে পুঁজিবাদীরা তাই কি মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে? আসলে যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙতে চান তাঁরা বিদ্যাসাগেরর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক না ভূমিকাকে বড় করে দেখতে চান। কারণ পরাধীন ভারতবর্ষে বাস করেও এই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা তিনি করেননি। 'নীতিকথা', 'চরিতাবাণী' রচনা করলেও সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা দীনবন্ধু মিত্রের মতো কৃষকদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার নিয়ে তাঁকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। সম্ভবত এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই বিদ্যাসাগরও ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। বাঙালি যে জাতি হিসেবে কত পিছিয়ে তা বাস্তববাদী বিদ্যাসাগর জানতেন। শুধু কুসংস্কার মুক্ত হবার জন্য নয়, একটি সর্বাঙ্গীন জীবনবোধ গড়ে তুলবার জন্য যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে তা তিনি মনে করতেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তার মধ্যেও এর প্রতিফলন আছে। তাই টুলো সংস্কৃতকে তাঁর পছন্দ হয়নি। সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজতর করার প্রয়াস তিনি নিয়েছিলেন। তিনি ব্যাকরণ কৌমুদী ও উপক্রমণিকা রচনা করেছিলেন। শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে পরিষ্কার বলেছেন যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সাহিত্যে সুদক্ষ ও শক্তিশালী হতে পারবে এবং সংস্কৃতের বদলে ইংরাজীর মাধ্যমে গণিত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময় দ্বিগুণ শিখতে পারবে। তিনি পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ভাষা ও সাহিত্যচর্চার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর বলাই বাহুল্য সেক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হতেই হবে। একটি জাতি নানাদিকে কিছুটা তৈরি না হয়ে স্বাধীনতাকামী হলে তা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য বিদ্যাসাগর তা যথার্থই বুঝেছিলেন। তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে রাজনৈতিক হটকারিতা সম্পর্কে সচেতন রেখেছে। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের যে স্বাদেশিকতার সূচনা হয়েছে তা সময়ানুগ বলা যায়। কেননা ইতিমধ্যে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মানস চেতনাকে অনেকটাই গড়ে দিয়েছেন।

যাই হোক এবার শিরোনামের ব্যাখ্যা দেওয়ার তাগিদ অনুভব করছি। প্রথমে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'মানবতাবাদী'র কথায় আসছি। শব্দ দুটি আলাদা হলেও বিদ্যাসাগরের বিশালতা বিশ্লেষণের জন্য যুক্ত করে দিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য যে ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী কথা দুটি আমরা ইউরোপীয় নবজাগরণ থেকে ধার করেছি। এ ধরণের শব্দের সঙ্গে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় ছিল না। শব্দের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও শব্দ দুটির বাস্তবায়ন করলে যে সব কাজের নমুনা আমরা দেখতে পাই, তা আমাদের চিন্তাজগতে অনুপস্থিত ছিল না। যেমন মানবতাবাদ। ইউরোপীয় মানবতাবাদ বহু সংগ্রামের মধ্যে উদ্ভব ও বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশে তার প্রয়োজন হয়নি। আমাদের চিন্তকরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলেই সকলকে বরণ করেছেন। মানবতাবাদের যে দ্যোতনা তাতো এর মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আর ধর্ম নিরপেক্ষতা। তারও প্রয়োজন হয়নি। ইউরোপে যে প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়েছিল, তা আমাদের দেশে অনুপস্থিত ছিল। আসলে ভারত তো শুধু একটি মাত্র দেশ নয়, একটি সভ্যতা। পাঁচ হাজার

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

বছরের সভ্যতা। অন্য দিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী একটি করে দেশ মাত্র। এদেরকে অবশ্য ইউরোপীয় সভ্যতা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

এই যদি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত হয় তাহলে তো বিদ্যাসাগরকে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভারতীয় বলা যায় না। কারণ বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হননি। তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন চাকুরী জীবনে প্রবেশ করার পর। তিনি যে বিষয়ে লেখাপড়া শিখে পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তা ছিল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। ছাত্রাবস্থায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। তাছাড়া ১৮২৯ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, তখনও ইংরেজী সরকারী ভাষার মর্যাদা পায়নি এবং ইংরেজীর ব্যাপক প্রসারও শুরু হয়নি। তাহলে মননের দিক থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরোপরি ভারতীয় চিন্তা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে আমরা পরবর্তীকালের আর একজন ভারতীয়র শিক্ষাজীবনের তুলনা করতে পারি। তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী। ঊনিশ শতকের ভারতের সমাজ ও মনন মনস্ক তারকাদের মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসাগর ও দয়ানন্দই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় লালিত পালিত হননি। অথচ বিদ্যাসাগরের সমাজ ও নারীমুক্তি সম্পর্কিত কাজ সমূহকে ইউরোপীয় পরিভাষায় মানবতাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর ইউরোপীয় ইতিহাস-দর্শন পড়ে মানবতাবাদী কাজে উদ্বুদ্ধ হননি। তাহলে বিদ্যাসাগরের মানবমুখী কাজের উৎসটা কি? ভারতীয় ঐতিহ্য? না, তা নয়। যদিও পূর্বেই উল্লেখ করেছি উপনিষদ যুগের ভারতীয় চিন্তকরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। চিন্তকরা লিপিবদ্ধ করলেও বাস্তবায়নের জন্য কেউ সচেষ্ট হননি। গৌতম বুদ্ধ অবশ্যই উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কিন্তু তিনি হিন্দু গন্ডির বাইরে গিয়ে বৌদ্ধ নাম নিয়ে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বাণীর যথার্থ রূপায়ক হয়েছিলেন। তাহলে কি আমরা অনুমান করতে পারি যে গৌতম বুদ্ধের কর্মে'র দ্বারা বিদ্যাসাগর অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন? এটা নিছকই অনুমান, তবে অমূলক নয় বোধ হয়।

এবারে ধর্মনিরপেক্ষতার কথায় আসি। বিদ্যাসাগরকে প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে অভিহিত করেছি শিরোনামে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এটি ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার অংশ বিশেষ। কিন্তু ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবনের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' তফাৎ আকাশ-পাতাল। ইউরোপ ধর্মকে নিরপেক্ষ করে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ধর্মীয় অনুশাসন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। গ্রেটবৃটেনের প্রধানমন্ত্রী বা রাজা-রাণী অবশ্যই প্রোটেষ্টান্ট হবেন, ক্যাথলিক নয়। আমেরিকাতেও অনুরূপ ধরণের বিধিনিষেধ আছে। এই কূট বিতর্কে প্রবেশ করা আমাদের লক্ষ্য নয়। তাই মূল আলোচনায় ফিরে আসছি।

ইউরোপীয় নবজাগরণের অন্যতম সোনালী ফসল হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ইউরোপের চিন্তাজগতের মঞ্চে ধর্ম অচ্যুত নয়। যে মানবমুখী সাহিত্য ও সমাজ ইউরোপে নবজাগরণের পরে তৈরী হয়েছিল, ধর্ম তার পরোক্ষ চালিকাশক্তি ছিল। সংশয়বাদী ও নাস্তিকদের আবির্ভাব ঘটলেও সমাজ-নিয়ন্ত্রক তাঁরা ছিলেন না। তবে সমাজ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিবাদমুখীতা কখনও কখনও নতুন সমাজ সংস্কারের সময় বিবেচিত হতো। ঔপনিবেশিক শাসনের মুঠোয় আসার ফলে ইউরোপীয় চিন্তাজগতের প্রধান, অপ্রধান ও প্রতিবাদী ধারাসমূহের প্রবাহ আমাদের দেশে এসে ঢেউ তুলেছিল। কিন্তু এই টেউও ছিল ধর্ম নির্ভর। ধর্মের আঙিনাতেই প্রথম ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ফলে ধর্ম জগতেই তথাকথিত ঊনিশ শতকের নবজাগরণের সোনার কাঠির স্পর্শ প্রথমে

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

লেগেছিল। ক্রমে তা ধর্ম থেকে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল। ঊনিশ শতকের সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাই ধর্মীয় আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের কুলগুরু রূপে পরিচিত রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এরা সকলেই কোন না কোন ধর্মীয় সভার সারথী ছিলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন একজন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ প্রমুখ অর্থাৎ তাবড় তাবড় চিন্তকদের সকলেই কোন না কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পরে ব্রাহ্ম সমাজে জোয়ার দেখা দিলেও, বিদ্যাসাগরকে সে জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় থেকে মধসূদন দত্ত পর্যন্ত বিভিন্ন উদীয়মান ব্যক্তিত্বের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র নিজ অবস্থানে অবিচল ছিলেন। আবার গোঁড়া হিন্দু মতাবলম্বীদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন।

এ কথা ঠিক যে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হননি। বিদ্যাসাগর বিষয়ক গবেষক বিনয় ঘোষ মনে করেন সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ধর্মের ব্যাপারে অক্ষয় কুমার দত্তও ছিলেন বিদ্যাসাগরের মতনই মুক্ত পুরুষ। বিদ্যাসাগর কোরান পড়েছিলেন বলেও জানা যায়। আর বাইবেল তো পড়াই স্বাভাবিক। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরই প্রথম সমাজমনস্ক ব্যক্তি যিনি ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাতিয়ার করে কোন ক্রমে অগ্রসর হননি। যা সমসময়ের ইউরোপ ও ঔপনিবেশিক ভারতের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক উজ্জল ব্যাতিক্রম হিসেবে আমাদের অভিনিবেশ দাবী করে। এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখেই বিদ্যাসাগরকে প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতীয় বলে আখ্যায়িত করেছি।

এবারে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাসের আলোচনায় আসা যাক্। বিদ্যাসাগর জীবনের এই দিকটি নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও অনুবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবীন বুদ্ধিজীবি গোপাল হালদার বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ তৃতীয়খন্ডের (সাহিত্য ও বিবিধ) ভূমিকা অংশের শেষে বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তারপরে ঐ বিষয়ে আর আলোচনার যৌক্তিকতা আছে কিনা; সে বিষয়ে সচেতন পাঠককূল প্রশ্ন তুলতে পারেন। পাঠকের সঙ্গে সহমত পোষণ করেও বলছি বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাস ও তার প্রায়োগিক বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা আছে।

বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে একটি মননধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থে'। তাঁর প্রবন্ধের নাম "বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন?' এই স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন আজহার উদ্দীনখান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া শ্রুতি মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর স্মরণিকায় 'ধর্মবোধ ও বিদ্যাসাগর' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এই স্মরণিকাটি সম্পাদনা করেছেন ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী। 'অনুষ্টুপ' শারদীয় সংখ্যা ১৩৯১-তে পরমেশআচার্য 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' আলোচনায় ধর্ম নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছেন। এরা ছাড়াও বিভিন্ন আলোচনার প্রসঙ্গে অনেকেই বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেছেন। এদের সকলের

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

আলোচনার কাঠামো ও বিশ্লেষণী ধারা মনে রেখেই অগ্রসর হয়েছি এ বিষয়ে কিছু বলার জন্য। এ আলোচনার প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিত দুই-ই শিরোনামের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় উপস্থাপন করেছি। সে আলোচনায় আর ফিরে যাচ্ছি না। কিন্তু ঐ আলোচনার সূত্র ধরেই বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাসের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবো। বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাসের মানসিক বাতাবরণটি আমরা তুলে ধরেছি। এবারে ধর্ম বিশ্বাসের প্রয়োগিক দিকটি অবলোকন করা যাক।

ধর্মের বাহ্যিক দিকটির প্রতি বিদ্যাসাগর বরাবরই উদাসীন ছিলেন, কিন্তু কখনো বিরোধিতায় নামেননি। সংস্কৃত কলেজে পাঠরত অবস্থায় মাঝে মাঝেই তিনি দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন না। গায়ত্রী মন্ত্রও ভুলে গিয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনীকার চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় অনুযোগ করেছেন। অন্যদিকে মাতাপিতার মৃত্যুর পর হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী কৌলিক আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। উপবীতও আমৃত্যুই ধারণ করেছিলেন। 'কালাপাহাড়' ইয়ং বেঙ্গলদের মতন হিন্দু ধর্মকে উদ্যত মুষল নিয়ে আক্রমণ করেননি কখনো। আসলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি লৌকিকক্রিয়া হিসেবেই মনে করতেন। তাই তাকে আঘাত করার কথা তাঁর মনে আসেনি। অন্ততঃ সেই সময়, যখন বঙ্গদেশের সমাজ জীবন পঙ্কিলময় ছিল। লৌকিক আচারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশের প্রয়োজন ছিল। তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং সেদিকেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর কোনো মন্দিরে কখনো যাননি। কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অর্থ দান করেননি। কাশীর পান্ডাদেরকে তিনি বলেছিলেন 'সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা আমার জনক-জননী, তাঁদের প্রসাদ পাই; আমার বিশ্বনাথ দর্শনে বা গঙ্গাস্নানে কি প্রয়োজন?' ধর্ম নিয়ে যাঁরা গোঁড়ামী করতেন, তাঁদেরকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে ছাড়েননি। রামতনু লাহিড়ীকে একবার এরূপ বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছিল। রামতনু লাহিড়ী বাড়িতে রান্নার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক খুঁজছিলেন। তখন বিদ্যাসাগর পরিহাস করে বলেছিলেন 'তুমি তো জাত মান না, তবে ব্রাহ্মণ পাচকের কী দরকার?' রামতনু জানালেন, 'না হলে গৃহিনীর চলবেনা'। শুনে বিদ্যাসাগর বলতে ছাড়লেন না 'বাপের কথায় পৈতেগাছটা রাখতে পারলে না; এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ?' সর্বশেষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের কথা দিয়েই এই বর্ণানাধর্মী আলোচনা পর্বের দাঁড়ি টানবো। বিদ্যাসাগরের নিকট থেকে রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পিহর বিশ্বাসভক্তির একটি কথাও আদায় করতে পারেননি। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে বিদ্যাসাগরের জীবনে । এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের ব্যবহারিক ধর্ম বিশ্বাসের কিছু নমুনা।

এবারে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর লেখার কয়েকটি নমুনা উপস্হাপন করছি। বোধোদয় দ্বিতীয় সংস্করণে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আগ্রহে ঈশ্বর বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করেছিলেন। এই অনুচ্ছেদ যুক্ত করার পিছনে আরো একটি প্রয়োজন সক্রিয় ছিল। সেসব হলো বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচারের প্রয়োজন। ইংল্যান্ডের সমাজে এই নিয়ে বিতর্ক শুর হয়েছিল। এক দল চেয়েছিলেন বিদ্যালয় পাঠক্রমের সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদের প্রচার করা হোক। আর এক দল চেয়েছিলেন ধর্মীয় মতবাদ নয়, ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করা হোক। এই দ্বিতীয় দলের প্রবক্তা ছিলেন জর্জ কুম্বে। বিদ্যাসাগরও এই মতবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতাদর্শানুযায়ী বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়' দ্বিতীয় সংস্করণে লিখলেনঃ 'ঈশ্বর সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্তা, তিনি প্রথমে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্ব্বত, তরু, লতা, মনুষ্য, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই তাহার সৃষ্টি। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা কহে।'

'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান এবং যাহা মনে ভাবি তাহাও জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন। তিনি যাবতীয় জীবজন্তুকে আহার দেন ও রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।' অনেকে মনে করেন, বোধোদয়ের মতই তাঁর ধর্ম মত। এমনতরো ধারণাকে নস্যাৎ করা যায় না। যদিও পরমেশ আচার্য তাঁর 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ', প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত যাবতীয় মূল্যায়নকে অসার প্রতিপন্ন করার কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পরমেশ বাবুরা যুগ বা সময়কে ভুলে যান। পরিবেশকে ভুলে যান। তাঁরা ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রতিক্রিয়া আশা করেন এবং আশা করে হতাশ হয়ে, উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেন। পরমেশ বাবুদের সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলবেন একুশ শতকের প্রথম প্রজন্মের তরুণেরা।

যাইহোক আলোচনার পূর্বস্থানে আবার ফিরে যাই। বিদ্যাসাগরের ধর্ম বিশ্বাস একান্তই তাঁর নিজের। ধর্মকে তিনি ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবেই ভেবেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় হিসেবে নয় এ রকম ভাবনার জন্যই তাঁর ধর্মচিন্তাকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিতে ইচ্ছে করে। কারণ মানবকল্যাণের বাইরের কোনো বিষয়কে তিনি ধর্ম হিসেবে মানতে রাজী ছিলেন না। ধর্ম বলতে প্রচলিত অর্থে আমরা যা বুঝি, তাতে বিদ্যাসাগরের আস্থা ছিল না। তাঁর বিশ্বাস মানবিক ধর্মে (Religion of man)। বিদ্যাসাগরের Religion of man থেকে কবিগুরুর Religion of man (মানুষের ধর্ম) ভিন্নতর। বিদ্যাসাগরের ধর্মের শেষ কথা মানুষ, মানুষের কল্যাণ। মধ্যযুগের কবির ভাষায় সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের কথা বাদ দিয়ে কোন ধর্মের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। এরূপ ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ বিদ্যাসাগর সমসময়ের ভারতবর্ষে দূরে থাক্, ইউরোপেও ছিলনা। ইউরোপে মানবতাবাদী বহু ছিলেন। কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবতা নয় । তাই বিদ্যাসাগরকে প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভারতীয় না বলে, সমকালীন বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বললেও অত্যুক্তি করা হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্রঃ

১) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ তৃতীয়খণ্ড, সম্পাদনা গোপাল হালদার
২) বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, সম্পাদনা প্রহ্লাদ কুমার প্রামানিক
৩) বিদ্যাসাগর, শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪) বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, আজাহার উদ্দীনখান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়
৫) অনুষ্টুপ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯১
৬) পশ্চিমবঙ্গ, ১৫ই নভেম্বর ১৯৯১
৭) এক্ষন, শারদীয় সংখ্যা ১৪০১
৮) ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরঃ একটি মার্ক্সবাদী মূল্যায়ন, প্রভাস ঘোষ
৯) উনিশ শতকের স্ত্রী শিক্ষা, সম্পাদনা স্বপন বসু
১০) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, বিনয় ঘোষ
১১) বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (সংকলন ও সম্পাদনা), শ্রী সুদিন চট্টোপাধ্যায়

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

১২) বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জী, শ্রী সন্তোষ কুমার অধিকারী
১৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ, বদরুদ্দীন উমর
১৪) যখন তখন (বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ১৯৯৩), সম্পাদনা মৃনাল দেব
১৫) Vidyasagar: The Traditional Moderniser, Amlesh Tripathi
১৬) Vidyasagar and New National Consciousness, Santosh Adhikari
১৭) Iswarchandra Vidyasagar: Present Times, Asit Kumar Bandhyopadhya